Vol. 35 | No. 1 | 1991

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা ধাঁধার বিষয়বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়

Volume	35
Issue	1
Year	1991
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	জীনাত ইমতিয়াজ আলী
Published online	October 1, 1991
DOI	10.62328/sp.v35i1.10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v35i1.10
Pages	175-180
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

গ্রন্থ-পরিচয়

বাংলা ধাঁধার বিষয়বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়।। শীলা বসাক
প্রকাশক : পুস্তক বিপণি, কলকাতা।। প্রথম সংস্করণ জুলাই ১৯৯০
মূল্য : ৭৫ টাকা। us$ ১৫ : ০০

ধাঁধা এক বিশেষ ধরনের রচনা যা চেনা মনে হলেও আপাত-পরিচিত সেই বহির্লোক আসলে মায়া, বাস্তবতার বিভ্রমমাত্র। ধাঁধার কুহেলিকলুষ জগতে প্রবেশ ও তার অর্থ-উদ্ধার তাই সহজ নয় এবং সে-অভিজ্ঞতা প্রায়শই পণ্ডশ্রমের, অনভিজ্ঞের জন্যে বেদনার, হোঁচট খাওয়ার, মধ্যরাত্রির চন্দ্রালোকে পথ চলার মতোই কেবলই ব্যর্থশ্রমে অবসিত ও বিধ্বস্ত হওয়ার।[১] প্রবাদের সঙ্গে ধাঁধার এখানেই লক্ষীয় পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য। প্রবাদের শ্রোতা অনপেক্ষ ও অনাসক্ত, কিন্তু ধাঁধায় তার স্থান প্রশ্নকর্তার সঙ্গে একাসনে বদ্ধ।[২] আর প্রকাশ–রূপের এই বৈলক্ষণই ধাঁধাকে করেছে গৌরবান্বিত, দিয়েছে চমৎকারিত্ব ও মেটাফোরের মর্যাদা।[৩] প্রবাদ-প্রসঙ্গে লালিত উন্নাসিক ভাব[৪] ধাঁধাকারদের সম্পর্কে অনুপস্থিত।[৫]

সুললিত, ছন্দময় ও শ্রবণসুভগ বাঁধার মতো গদ্য-ফর্মে রচিত ধাঁধাও সুপ্রচুর। ধাঁধার অস্তিত্বের ইতিহাসও দীর্ঘকালের। বলা যায়, মানুষের সৃষ্টিশীলতারই তা সমান বয়সী। সংস্কৃত, হিব্রু, আরবি ও ফারসি ধাঁধাসংকলনের ইতিহাসও কয়েক শতাব্দী প্রাচীন।[৬] ষোড়শ শতকে সংগৃহীত ও গ্রন্থবদ্ধ নিকোলাস রেইসনার-এর এনিগমাটোগ্রাফিয়া (১৬০২)-ই ইংরেজি ধাঁধার উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ। বাংলা ধাঁধা সংগ্রহ ও প্রকাশের প্রচেষ্টাও একেবারে অর্বাচীন নয়। সাম্প্রতিক-কালেই বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী-সংকলিত ও কাজী দীন মুহম্মদ সম্পাদিত *লোক-সাহিত্য : ধাঁধা ও প্রবাদ* শীর্ষক গ্রন্থ। লক্ষণীয়, একান্ত ধাঁধাসংকলনের ঐতিহ্য আমাদের নেই। এককভাবে কেবলই ধাঁধাকে উপজীব্য করে রচিত হয়েছে তেমন গ্রন্থ সুপ্রচুর তো নয়ই— বরং

বিরলদৃষ্টই বলা যায়। ড. শীলা বসাক সে অভাব পূরণে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর *বাংলা ধাঁধার বিষয়বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়* তাই ঐতিহাসিক মূল্যে ও তাৎপর্যে বিশিষ্ট।

শীলা বসাক তাঁর গ্রন্থ ছটি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন। সবার আগে গ্রন্থপ্রবেশিকা-রূপে স্থান পেয়েছে 'ভূমিকা'-অংশ। এ পর্বে লেখিকা সংক্ষেপে অথচ প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্তের পরিচর্যায় ধাঁধাকে সংজ্ঞাবদ্ধ[৭] করা ছাড়াও আলোচনা করেছেন ধাঁধার উৎপত্তি ও এ সম্পর্কিত বিভিন্ন মতবাদ, ধাঁধার গঠন, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এবং বাংলা ধাঁধার আঙ্গিক-বৈচিত্র্য।

প্রথম অধ্যায় থেকেই মূল-বিষয় অভ্যন্তরের দিকে শুরু হয়েছে লেখিকার যাত্রা। ধাঁধার বিষয়বৈচিত্র্য নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি দেখেছেন যে, জীবনের বিচিত্র উপলব্ধি ও সমাজ-সংগঠনের রূপান্তরের সঙ্গে সমান্তরালভাবে ধাঁধার জগৎ হয়েছে প্রসারিত ও ব্যাপ্ত। বস্তুত, কোনো নরগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতি ও তাদের জীবনাচরণের স্বাতন্ত্র্যই শুধু নয়, প্রত্যক্ষ ও দৃশ্যমান বস্তুজগৎ, নৈর্ব্যক্তিক উপলব্ধি, এমনকি আধ্যাত্মিক চেতনাকে পর্যন্ত উপজীব্য করে ধাঁধা রচিত হয়েছে। ধাঁধার শ্রেণী-পরিচয় নির্দেশ তাই সহজ নয়, এ ক্ষেত্রে মতপরম্পরার প্রাবল্য সহজেই লক্ষণীয়। টেলর যেখানে বিষয়বস্তুর সাদৃশ্যকেই প্রাধান্য দিয়েছেন সেখানে হেলসিংকি বস্তু-সাদৃশ্যের আলোকেই ধাঁধার শ্রেণীবিভাগ নির্ণয়ে হয়েছেন যত্নশীল। আশুতোষ ভট্টাচার্য আবার সমন্বয়পন্থী, ধাঁধাকারদের সৃষ্টিশীল সত্তার অপূর্বত্ব বিচারেরই পক্ষপাতী। তাঁর মতে, ধাঁধা মূলত দু-শ্রেণীতে বদ্ধ— সাহিত্যিক ধাঁধা ও লৌকিক ধাঁধা। লেখিকা আশুতোষ ভট্টাচার্যকেই আদর্শ মেনেছেন এবং সে-অনুসারেই বাংলা ধাঁধার বিষয়বৈচিত্র্য নির্দেশে হয়েছেন সচেষ্ট।

সাহিত্যিক ধাঁধার সঙ্গে ঐক্য খুঁজে পাওয়া যায় আদি মহাকাব্যের। লোকমুখে পরিবাহিত হয়ে ও বহু প্রতিভার পরিচর্যায় এ সব ধাঁধা চিরায়ত কাব্যগুণ লাভ করেছে। সাহিত্যিক ধাঁধার দৃষ্টান্ত খুঁজতে গিয়ে লেখিকা প্রাচীন ও অন্ত-মধ্যযুগের প্রায় সমগ্র এলাকাই অনুসন্ধান, চর্যাপদ থেকে মঙ্গলকাব্যের জগৎ পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেছেন।

আধ্যাত্মিক ধাঁধা সাহিত্যিক ধাঁধার পর্যায়ভুক্ত হলেও স্বতন্ত্রভাবে লেখিকার তা নির্দেশের মূলে রয়েছে এ জাতীয় ধাঁধার আর্থ বৈচিত্র্য। তাঁর কথায়—

> ধাঁধার অর্থ বিশ্লেষণ করে তা বুঝবার যে গতানুগতিক পদ্ধতি রয়েছে, আধ্যাত্মিক ধাঁধায় তা অনুসরণ করা হয় না।[৮]

এ জাতীয় ধাঁধার অর্থ কেবল 'গুরুর কাছ থেকে শিষ্যই বুঝতে পারে' এবং শিষ্যপরম্পরায় এর প্রচার হয়ে থাকে। সাহিত্যিক ধাঁধার মতো আধ্যাত্মিক ধাঁধারও আদি উৎস চর্যাপদ। সান্ধ্য-ভাষায়, গূঢ় সংকেতের সাহায্যে বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকেরা চর্যাপদে তাঁদের সাধনাতত্ত্বের উল্লেখ করেছেন। গোরক্ষবিজয়, গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস এমনকি লালনের অসংখ্য গানও আধ্যাত্মিক ধাঁধার দীপ্র উদাহরণ হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছে।

উল্লিখিত দুই প্রকার ধাঁধা ছাড়াও আরও এক ধরনের ধাঁধা জনসমাজে প্রচলিত রয়েছে এবং এ সব ধাঁধা শুধু সংখ্যাধিক্যে নয়, ব্যবহারিক তাৎপর্যেও বিশেষভাবে গুরুত্ববহ। এই লৌকিক ধাঁধার মাধ্যমেই কোনো জনগোষ্ঠীর প্রকৃত পরিচয় নির্ণীত হয়। লেখিকাও দেখিয়েছেন যে, মানব-জীবন, একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বসবাসকারী নৃগোষ্ঠীর সামগ্রিক পরিচয়, তাদের গার্হস্থ্য জীবন, ধর্মভাব, গৃহপালিত জীবজন্তু, ভালোলাগা-মন্দলাগা, জীবনসংগ্রামের খুঁটিনাটি পর্যন্ত এ জাতীয় ধাঁধায় উঠে এসেছে। গ্রন্থের এ অংশ দীর্ঘ এবং লেখিকার শ্রম-অকাতর ও তথ্যসন্ধ মনের একান্ত পরিচয়ে প্রোজ্জ্বল।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখিকা একেবারে বাঙালির জীবন-জীবিকার গভীরে প্রবেশ করেছেন। বাংলাদেশ চিরকালই কৃষিনির্ভর। অল্প কিছু ভিন্নতা লক্ষ করা গেলেও আমাদের জীবিকা মূলত কৃষির সঙ্গেই বাঁধা। কিন্তু কৃষিকাজের অভিজ্ঞতা সবসময় সুখের নয়। প্রকৃতিক দুর্যোগ কখনও-কখনও কৃষককে অনিশ্চয়তার মধ্যে নিক্ষেপ করে। তখন বিনষ্ট হয় কৃষকের ক্ষেতের ফসল। পল্লিকবিরা অনিবার্যভাবেই কৃষি, কৃষিকর্মে ব্যবহৃত নানা উপাদান— গোরু, লাঙল, ধান, ধানের চারা, জমির আল, ধানকাটা কাচি ইত্যাদি এবং মেঘ-বৃষ্টিকে উপজীব্য করে রচনা করেছেন অসংখ্য ধাঁধা। লেখিকা অতি যত্নের সঙ্গে এ সব ধাঁধাঁ সংগ্রহ এবং প্রসঙ্গবদ্ধও করেছেন। একই ধাঁধা আবার অঞ্চলভেদে লাভ করেছে ভাষাগত ও সাংগঠনিক বৈচিত্র্য। অভিন্ন বিষয়কে আশ্রয় করে রচিত হয়েছে দুটি ধাঁধা পাশাপাশি দুই জেলা সিলেট ও চট্টগ্রামে। কিন্তু ধাঁধাদ্বয়ের রূপালংকারে রয়েছে উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্য। পাঠকের অবগতির জন্যে শীলা বসাকের গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক ধাঁধাটি তুলে দেয়া হল :

চট্টগ্রাম : ঘরত খায় বনত চলে
ফিরে বাড়ী বাড়ী
অর্দ্ধ অঙ্গ পুরুষের
অর্ধ-অঙ্গ নারী।

সিলেট : পাড়ে পাড়ে বাকল
এ না অইলে নাই
বাঙ্গালোর আকোল।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় 'বাংলাদেশের পরিবার, গার্হস্থ্যজীবন ও বাংলা ধাঁধা।' বাঙালি পরিবার মুখ্যত একান্নবর্তী, অন্তত অতীতে তা-ই ছিল এবং এই পারিবারিক গঠনের কারণেই পরিবার-অন্তর্গত সদস্যদের মধ্যে গড়ে উঠেছে সুসম্পর্ক, প্রগাঢ় আন্তরিকতা। ধাঁধার কবিরাও এই জীবনই যাপন করতেন। নিজেদের সৃষ্টিকর্মেও তাঁরা অভিজ্ঞতার বাইরে যেতে পারেনি। মা-বাবা, পুত্র-কন্যা, শ্বশুর-শাশুড়ি–জামাইকে বিষয় হিসেবে নির্বাচন করে তাঁরা হয়েছেন সৃষ্টিচঞ্চল। লেখিকাও দেখিয়েছেন যে, ধাঁধার জগতের মধ্যে বাংলার পারিবারিক জীবনের একান্ত পরিচয়ই হয়েছে অভিব্যক্ত।

চতুর্থ অধ্যায়ের অন্বিষ্ট বিষয় বাঙালির জীবনচর্যা। শ্রমজীবী গ্রামীণ মানুষের জীবনে তেমন অবসর নেই। ঘন-ঘোর ও অবিশ্রান্ত বর্ষণ কখনও-কখনও সেই বহু প্রত্যাশিত সুযোগ বয়ে আনে। গ্রামবাসীরা নিজেরাও অনেক সময় অবসর নির্বাচন করে নেয়। বৈচিত্র্যময় ও পুনরাবৃত জীবনে একটুখানি অবসর মিললেই তারা শুরু করে গল্প বলা, নিয়োজিত হয় জারি-সারি-ভাটিয়ালি পরিবেশনে, ধাঁধার সৃষ্টিতে। আর এ সবের মাধ্যমে পল্লিকবির সৃজন–প্রতিভার পরিচয়ই বেরিয়ে আসে। সে-দিক থেকেও ধাঁধা জীবন-বিচ্ছিন্ন নয়, বরং পল্লিবাসীর জীবন-বাস্তবতা ও জীবন-সংগ্রামেরই তা অনিবর্চনীয় রূপকল্প।

'বাংলার আচার-অনুষ্ঠান, উৎস ও বাংলা ধাঁধা' শীর্ষক পঞ্চম অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায়েরই সম্প্রসারিত অংশ। এ দুই বিবেচনাকে একত্রিত ও সমীকৃত করে অভিন্ন অধ্যায়েও উপস্থাপন করা যেত। কেননা, আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব কিংবা পার্বণ সমাজ ও সমাজাশ্রিত জীবনের সঙ্গেই যুক্ত, অভিন্নও বলা যায়। এখানে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য। বর্তমান অধ্যায়ের শিরোনামায় বিষয়বস্তুর যে-ব্যাপ্তি ও গভীরতা আভাসিত হয়েছে অধ্যায়-অভ্যন্তরে তার বিস্তৃতি সে-অনুপাতে ঘটেনি। এ ক্ষেত্রে লেখিকার আরও পরিশ্রমী ও অভিনিবিষ্ট হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়ও তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত। ধাঁধার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের বলারও বেশি কিছু নেই। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, প্রতীচ্য ধনবাদী সভ্যতা যেভাবে আমাদের স্পর্শ, স্পৃষ্ট ও প্রভাবিত করে চলেছে তাতে কোনো নির্দ্বিধ মন্তব্য সুবুদ্ধি মানুষের সাজে না। ভবিষ্যতে হয়ত সমগ্র লোকসাহিত্যই শীতল জাদুঘরে স্থান

পাবে এবং ধাঁধার ললাটলিপিও সেই একই রজ্জুতে সম্ভবত বাঁধা থাকবে।

বাংলা ধাঁধার বিষয়বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয় - এর সব শেষে আছে 'ক্ষেত্র সমীক্ষা।' এ অংশকে কোনো অধ্যায়ে বদ্ধ করা হয়নি। 'ক্ষেত্র-সমীক্ষা'কে মূলগ্রন্থের পরিশিষ্ট অংশ বলেও আমরা গ্রহণ করতে পারি। স্মরণীয়, আলোচিত গ্রন্থটি শীলা বসাকের পি-এইচ ডি অভিসন্দর্ভ। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে, এ জন্যে প্রয়োজনীয় তথ্য অপর্যাপ্ত হলে গ্রহণ করতে হয় ভিন্ন প্রক্রিয়ার, বাস্তব উপাত্ত সংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণের। লেখিকা সেভাবেই পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার বহু গ্রামে স্বয়ং ভ্রমণ এবং প্রত্যক্ষ উৎস থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। বর্তমান অংশে তাঁর সেই দীর্ঘ শ্রমের পরিচয়ই পাওয়া যায়। তিনি প্রকৃতই একজন গবেষক। তাঁর সংগ্রহ অন্য গবেষকের প্রয়োজনে আসবে। তাঁকে দেখে তাঁরাও প্রেরণা পাবে।

শীলা বসাকের ভাষায় এক ধরনের সাংবাদিক–সরলতা আছে। সরল বাক্যগঠন প্রক্রিয়াই তাঁর প্রিয় রীতি এবং বক্তব্য–উপস্থাপনে অনিবার্য না–হলে তিনি যৌগিক বাক্য গঠন রীতিকে প্রশ্রয় দেননি। কিন্তু সহজ কথা সহজে বলার মেধা ও দক্ষতা তাঁর আছে। আমরাও শীলা বসাকের গ্রন্থের সঙ্গে সহজেই ঐকাত্ম্য হয়ে উঠতে পারি। আমাদের বিশ্বাস, অনুরাগীজনেরও সেই একই অভিজ্ঞতা হবে, আমাদের মতো তাঁরদেরও প্রাপ্তি হবে একটি ভালো, তথ্যসমৃদ্ধ অথচ মেধা ও অনুভূতিস্পর্শী বই পড়ার আনন্দ।

তথ্যনির্দেশ

১ *The Random House Dictionary of the English Language*, 1966, p 1232

২ পবিত্র সরকার; এপ্রিল ১৯৯১, *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি*, কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশনী, পৃ ৪৩

৩ Thomas A Sebeok (ed.), 1974, *Myth : A Symposium*, Bloomisgton : Indiana University Press, pp 64-80

৪ "অনেকের ধারণা, এই বিষয়বস্তুর তুচ্ছতা বা দৈন্যের জন্যই প্রবাদে পটু ও কটু রসিকতা, ছড়ার ছন্দ, মিলের পারিপাট্য ও অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দালঙ্কারের ভঙ্গিমা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্য তাঁহারা প্রবাদ–বাক্যকে

মনস্কয়া ভণ্ডামি বা চাষাড়ে ইয়ার্কির চটকদার রূপান্তর বলিয়া মনে করেন।"— সুশীলকুমার দে, পরিবর্ধিত তৃতয় সংস্করণ ১৩৯২, *বাংলা প্রবাদ*, কলিকাতা : এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ ১৮

৫ "ধাঁধার ভিতর দিয়া যে কেবল পরিণত শিল্পমন ও রসবোধেরই পরিচয় প্রকাশ পায় তাহা নহে– ইহার ভিতর দিয়া সূক্ষ্মহাস্য রসবোধেরও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। বুদ্ধির অনুশীলন কিংবা জ্ঞানের চর্চা ইহার চরম লক্ষ্য নহে, ইহার চরম লক্ষ্য নির্মল হাস্যরস সৃষ্টি।— আশুতোষ ভট্টাচার্য; ১৯৬২, *বাংলার লোকসাহিত্য*, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, পৃ ৫১৪

৬ J. A. Cuddon; 1979, *A Dictionary of Libeary Terms*. p 574

৭ ইংরেজি defination-অর্থে লেখিকা 'সংজ্ঞা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু বাংলা 'সংজ্ঞা' ও ইংরেজি ডেফিনেশনের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। Defination বলতে 'the act of defining or making definite or clear' বোঝায় (দ্র. *The Random House Dictionary of English Language*. p.379)। আর বাংলা 'সংজ্ঞা' শব্দের অর্থ 'নাম, পরিভাষা' (দ্র. মণীন্দ্রনাথ ঘোষ; দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৩৯, *বাংলা বানান*, কলিকাতা : দে'জ পাবলিশিং, পৃ ১৪৩)। বাংলা অভিধানেও ইংরেজি ডেফিনেশনের পারিভাষিক শব্দ হিসেবে 'সংজ্ঞার্থ'–ই গ্রহণ করা হয়েছে (দ্র. শৈলেন্দ্র বিশ্বাস সংকলিত; জুলাই ১৯৯০, *সংসদ্ বাঙ্গালা অভিধান*, কলিকাতা : সাহিত্য সংসদ্, পৃ ৭৫৩)।

৮ *বাংলা ধাঁধার বিষয়বৈচিত্র্য ও সামাজিক পরিচয়*, পৃ ২৯

—জীনাত ইমতিয়াজ আলী